পাকিস্তান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সম্পর্কে

শ্বেতপত্র

৫ই আগষ্ট, ১৯৭১

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

সংঘর্ষ অভিমুখে ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংকট ঘনীভূত হলো ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস ২৯

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুস্তানের ভূমিকা ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ৫৫

পরিশিষ্ট—ক

প্রেসিডেন্টের নীতি-নির্ধারণী ভাষণসমূহের অংশবিশেষ ১

পরিশিষ্ট—খ

আইনকাঠামো আদেশ, ১৯৭০ .... ২৪

পরিশিষ্ট—গ

আওয়ামী লীগের ছয় দফা ৪৬

পরিশিষ্ট—ঘ

আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী, মার্চ, ১৯৭১ .... ৪৮

পরিশিষ্ট—ঙ

আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র ৬১

পরিশিষ্ট—চ

পাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র, ১৯৬২ .... ৭৬

পরিশিষ্ট—ছ

প্রধান প্রধান নৃশংসতার তালিকা ৮০

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা ৮৯

ভূমিকা

এই শ্বেতপত্র পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সঙ্কটের ঘটনাবলীর সর্বপ্রথম পূর্ণ বিবরণ। আওয়ামী লীগ নেতাদের মনোভাবের দরুন নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিরা একটি ফেডারেল শাসনতন্ত্রের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে একটা মতৈক্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হলে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয়। আওয়ামী লীগ নেতারা স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনগণের রায়কে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিবর্তিত করার প্রয়াস পান।

এ-সব ঘটনার প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য, এ-পর্যন্ত বিশ্বকে অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যই সরবরাহ করা হয়েছে। এই শ্বেতপত্রে সেই সব ঘটনাবলীর বিস্তারিত পটভূমিকা দেয়া হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার উদ্দেশ্যে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়।

পূর্ব পাকিস্তান-সঙ্কট হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অপরিহার্য মূলবিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

(১) ১৯৭০ সালের আইনকাঠামো আদেশের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই এই আইন-কাঠামো আদেশ গ্রহণ করেছিলেন। এই আদেশ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে, পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা হচ্ছে যে-কোন ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক পূর্ব-শর্ত।

(২) ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ফেডারেল সরকার যে-ব্যবস্থা শুরু করেন তার লক্ষ্য ছিলো আইন-শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কারণ আওয়ামী লীগের "অহিংস-অসহযোগ" আন্দোলনের সময় আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছিলো। এই সময়ে যে গোলযোগ এবং নৃশংস কার্যকলাপ চালানো হয় এই শ্বেতপত্রে তা' বিবৃত করা হয়েছে।

(৩) হিন্দুস্তান হস্তক্ষেপ না করলে এবং প্ররোচনা না যোগালে পরিস্থিতি বেশ শিগ্‌গীরই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতো।

প্রথম অধ্যায়

সংঘর্ষ অভিমুখে

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতিতে জাতি এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয় যার ফলে ১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ সামরিক আইন জারী করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জাতির উদ্দেশে তাঁর সর্বপ্রথম ভাষণে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান বলেন, "আমি আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুস্থ এবং গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবাধে ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের কাছে নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, নিষ্কলঙ্ক এবং সৎ সরকার। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং য-সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করছে তার একটা সমাধান বের করা।"

এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট সব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমার সরকার আপনাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখবেন।" তিনি অবশ্য জোর দিয়ে বলেন "কোন ব্যক্তি, দল কিংবা গোষ্ঠী যারাই ইসলামের মূলনীতিসমূহ এবং পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি-বিরোধী প্রচারণা চালাবে কিংবা আমাদের জনগণের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে, তারাই জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর ক্রোধভাজন হবে।"

এর পর কয়েক মাস ধরে প্রেসিডেন্ট সারাদেশে রাজনীতিবিদ এবং জনমতের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা-পরামর্শ চালান। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় রাষ্ট্রনেতার মতো শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটির সমাধানের জন্য তাঁর জরুরী আবেদন সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনরকম মতৈক্য দেখা যাচ্ছে না।

তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। প্রথমটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করে দেয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্য "একজন লোক—একটি ভোট"—এই নীতি গ্রহণ। এর ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে Parity বা সমতার যে-নীতি আওয়ামী লীগসহ

সব রাজনৈতিক দলই মেনে নিয়েছিলেন এবং যা ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রেও গৃহীত হয়েছিলো তা' পরিত্যক্ত হোল। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের ফলে এই প্রথমবারের মতো জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থায়িভাবে কায়েম হোল।

রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবং জনগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছে অনুসারে প্রেসিডেন্ট কতকগুলো বিষয়কে স্থিরীকৃত বলে ঘোষণা করেন। এসব বিষয় হচ্ছে :

(১) ফেডারেল পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার।

(২) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার-ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

(৩) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার-রক্ষার নিশ্চয়তাবিধানের ব্যবস্থা।

(৪) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র-রক্ষকের ভূমিকা দেয়া। এবং

(৫) যে-আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা' অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি ইসলামী ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন।

প্রেসিডেন্ট আরো প্রকাশ করেন যে, ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ নাগাদ একটি আইন-কাঠামো এবং জুন মাস নাগাদ ভোটার-তালিকা তৈরী করে ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয় পরিষদকে তার প্রথম অধিবেশন থেকে শুরু করে ১২০ দিনের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, "তাঁরা যদি এই মেয়াদের আগেই এই কাজ সম্পন্ন করেন তাহলেও আমি সুখী হবো। কিন্তু তাঁরা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং আবার নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি এবং কামনা করি যেনো তা' না ঘটে এবং এজন্যই আমি ভবিষ্যৎ গণপ্রতিনিধিদের পূর্ণ দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে এই কাজ হাতে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

১৯৭০ সালের পয়লা জুন সারাদেশে সাধারণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী অভিযান শুরু হয়। এই সময় প্রেসিডেন্ট সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত ও স্থানীয় বিবেচনার উর্ধ্বে উঠার জন্য সবদলের প্রতি আবেদন জানান। সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। সব সরকারী কর্মচারীকেই পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কড়া নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি আরেকবার আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই যে, যতদূর পর্যন্ত নির্বাচনী অভিযানের সম্পর্ক রয়েছে, বর্তমান সরকার আগেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। সরকার অবশ্য আশা করেন যে, কোন রাজনৈতিক দল কিংবা ব্যক্তি পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি-বিরোধী প্রচারণা কিংবা কার্যকলাপ চালাবেন না।"

একই ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইনকাঠামো আদেশ (১৯৭০)-এর মূল ধারাগুলো ঘোষণা করেন। এই আদেশের ভিত্তিতেই সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেন।

এই "আইনকাঠামো আদেশ"-এর উপক্রমণিকায় বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে "এই আদেশ-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরী করা।" আদেশের ১৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, "জাতীয় পরিষদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তাঁর বিবেচনা মতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন।" আরো ঠিক করা হয় যে, জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের ১২০ দিনের মধ্যে "শাসনতন্ত্র বিল" নামে একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন এবং তা' করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। জাতীয় পরিষদের পাশ-করা শাসনতন্ত্র-বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ ফেডারেশনের প্রথম আইন পরিষদ হিসেবে তার কাজ শুরু করতে পারবেন না এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলোর অধিবেশনও ডাকা হবে না।

ফেডারেল শাসনতন্ত্র-তৈরীর একটা ঐতিহাসিক রীতি এই যে, শাসনতন্ত্রের পেছনে হয় ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর সর্বসম্মত সমর্থন কিংবা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর বেশীর ভাগের সম্মতি থাকতে হবে। এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছিলো প্রেসিডেন্টের নিম্নোক্ত মন্তব্যে। "শাসনতন্ত্র হচ্ছে একটা পবিত্র দলীল এবং একত্রে বসবাসের মৌলিক চুক্তি। কোন সাধারণ আইনের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না।"

আইনকাঠামো আদেশে শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কতকগুলো মূলনীতি দেয়া হয়। এসব মূলনীতির মধ্যে ছিলো :

(১) "জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অবাধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(২) "নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা হবে এবং এই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(৩) "মামলা-মকদ্দমার বিচার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচার-বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।"

(৪) "আইন তৈরী সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সব রকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন কিন্তু একইসঙ্গে ফেডারেল সরকারও বাইরের ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব-পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।"

(৫) "নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেনো :

(ক) পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এবং

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সব রকম বৈষম্য দূর করা হয়।

(৬) "শাসনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে—

(ক) পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারবেন। এবং,

(খ) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম-পালন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সব রকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারবেন।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এই আদেশে বলে দেয়া হয়, "পাকিস্তানে বর্তমানে যে-সব প্রদেশ ও এলাকা রয়েছে কিংবা পরে যে-সব প্রদেশ ও এলাকা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তারা সবাই একটি ফেডারেশনের অধীনে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে যেনো পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতি নিশ্চিত হয় এবং ফেডারেশনের সংহতি কোন রকমেই ব্যাহত না হয়।"

প্রেসিডেন্ট তাঁর ২৮শে মার্চের ভাষণে বলেন, "আমাদের জনগণ গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। সুতরাং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন কাজ ছাড়া প্রায় সব জিনিসই বরদাশ্‌ত করবে। যদি কেউ মনে করে যে, সে দেশ কিংবা জনগণের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করতে পারবে কিংবা কেউ যদি আমাদের জনগণের মৌলিক ঐক্য নষ্ট করতে পারবে বলে মনে করে, তবে সে বড় ভুল করবে। জনগণ এটা কোন প্রকারেই বরদাশ্‌ত করবে না।....দেশের শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান দেয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণের সংহতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন কোন সমাধান দেয়ার অধিকার কারুরই নেই। কেউই তা বরদাশ্‌ত করবে না।"

আওয়ামী লীগ তাদের ৬-দফা যেভাবে জনগণের কাছে পেশ করেন তাতে পাকিস্তানের সার্বভৌম মর্যাদায় কোনরকম পরিবর্তন সাধনের দাবী ছিলো না। প্রথম দফায় বলা হয়, "সরকারের ধরন হবে ফেডারেল ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির।" শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাসমূহে বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছেন, দেশকে ভাগ করা কিংবা তার ইসলামী আদর্শকে দুর্বল করা তাঁর লক্ষ্য নয়। ১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "৬-দফা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে এবং তাতে পাকিস্তানের সংহতি কিংবা ইসলাম বিপন্ন হবে না।" ১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি নির্বাচনকে "প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে একটি গণভোট" বলে অভিহিত করেন। ৬ই নভেম্বর ১৯৭০ সিলেটে আরেক ভাষণে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের ৬-দফা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তাবিধান করা।" আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও একই ধরনের কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ

১৯৭০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে বলেন যে, "৬-দফা আদায়ের প্রশ্নটি দেশের অখণ্ডতা ও সংহতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।"

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে এক জনসভায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা তাঁর দলের উদ্দেশ্য নয়। এর আগে, ১৯৭০ সালের ২১শে জুন রাজশাহীতে এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ ১৯৭০ সালের ২০শে মার্চ ফেনীতে এক জনসভায় বলেন, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী পাকিস্তান গঠন করা। তিনি বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন একটি শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়ক হবে।

যাহোক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোগীদের এসব বক্তৃতার মধ্যে আরো এমন সব কথা ছিল যা অত্যন্ত আবেগপ্রসূত এবং তথ্যের দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। ১৯৭০ সালের ১১ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের হাজারীবাগ পার্কে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মওলানা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রমুখের কাছে জানতে চান যে তাঁরা তাঁদের প্রভুদের মাধ্যমে বাংলার যে সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন তা ফিরিয়ে দিতে আর কত সময় নিবেন।

তিনি বাঙালীদেরকে এই মাহেন্দ্রক্ষণে জেগে ওঠার এবং বাংলার পবিত্র মাটি থেকে রাজনৈতিক মীরজাফর এবং পরগাছাদের নির্মূল করার আহ্বান জানান। ১৯৭০ সালের ১০ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, "বিগত বৎসরগুলোতে শোষক এবং ডাকাতরা বাঙালীদের রক্ত-মাংস চিবিয়ে খেয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক গগন থেকে তাদেরকে বিদায় করতে হবে।"

পরদিন ঢাকা জেলার কাপাসিয়ায় কালালেশ্বর হাই স্কুলে আরেক জনসভায় তিনি বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর শোষণকারী পূর্ব বাংলাকে গত ২৩ বছর ধরে শোষণ করেছে। পাকিস্তানের ইতিহাস একটি ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, অব্যাহত নির্যাতন ও শোষণের ইতিহাস।"

এরপর পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বাচনী অভিযান শুরু হয় তাতে আওয়ামী লীগ এমন অসংযমের পরিচয় দেয় যে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য সব দল অভিযোগমুখর হয়ে উঠে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অভিযানের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানান তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

(১) জনাব নূরুল আমীন—পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী।

(২) জনাব আবদুস সালাম—পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি

(৩) জনাব মাহমুদ আলী—পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সহ-সভাপতি।

(৪) প্রফেসর গোলাম আযম—পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর।

(৫) সৈয়দ আলতাফ হোসেন—পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক।

(৬) পীর মহসিনউদ্দিন—পূর্ব পাকিস্তান জমিয়াতে উলেমায়ে ইসলামের সভাপতি; এবং

(৭) মিসেস আমেনা বেগম—পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের উর্ধ্বতন সহ-সভানেত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী।

১৯৭০ সালে এঁরা এবং অন্যান্য নেতারা জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি, জনসভা পণ্ড করে দেওয়া, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর দৈহিক আক্রমণ এবং পার্টির দফতর লুঠ ও বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই সমালোচনা দিন দিন বাড়তেই থাকে। কিন্তু পাছে নির্বাচন অভিযানে সরকার হস্তক্ষেপ করেছেন বলে মনে করা হয়, এজন্য সরকার এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

ঢাকার পুরানো পল্টন ময়দানে ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য একটি দলের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে, একজন লোক নিহত এবং পাঁচ শতাধিক লোক আহত হয়। জামাত-ই-ইসলামী এই সভার আয়োজন করেছিলো। জামাত-ই-ইসলামী প্রমাণ করেছিলো যে "ময়দানে ঢুকে যারা শ্রোতাদের উপর হামলা চালিয়েছিলো, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা ছিলো এবং গুণ্ডাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতবোমা ছিলো।"

ঢাকার দৈনিক পত্রিকা পাকিস্তান অবজার্ভার এই ঘটনাকে নিন্দা করে ১৯৭০ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রকাশ করে যে, "সন্ধ্যার পর ঘটনাস্থলে দলে দলে লোকের পুনরাগমন, সভা পণ্ড করা, মঞ্চ পুড়িয়ে ফেলা এবং কয়েক হাজার শ্রোতাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটা প্রমাণ করে যে এটা একটা সুপরিকল্পিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। তা না হলে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বিনষ্ট করা সম্ভব হতো না।"

যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নেয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাদের নিন্দা করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন: "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কেউ হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাহায্য নেয়, তাহলে মনে করা হবে যে সে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাকে জনমতের সামনে জবাবদিহি করতে হবে।" তিনি আরো বলেন: যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপ দিয়ে তর্কের মীমাংসায় পৌঁছুতে চায়, তারা যে শুধু তাদের দাবীর প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ করে তাই নয়, গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের আস্থার অভাব প্রমাণ করে—একথা তারা যতোই অস্বীকার করুক না কেনো।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর—পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে আর একটি দলের একটা জনসভায় মারপিট হয়। ১৭ জন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যুক্ত এশতেহারে এর

নিন্দা করে বলেন, "কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী এবং গুণ্ডারা সুসংবদ্ধভাবে ১৯৭০ সালের ২১শে জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভা পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করে।" সেই একই দিন (২১শে জানুয়ারী ১৯৭০ সাল) পৃথক একটি যুক্ত বিবৃতিতে এই নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে গুণ্ডামী এবং সন্ত্রাসনীতি অবলম্বন করার জন্য বিশেষভাবে দোষারোপ করেন।

১৯৭০ সালের ২২শে জানুয়ারী ঢাকার জামাত-ই-ইসলামীর দফতরে হামলা করা হয়। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "আমাদের দফতরে হামলা চালানোকালে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত গুণ্ডারা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে আসবাবপত্রাদি ভেঙ্গে তছনছ করে, সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলে এবং পার্টির কাগজ-পত্র, দলিল এবং পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়।"

১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক জনসভায়ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা 'জয়বাংলা' শ্লোগান দেয়। গোলযোগের মধ্যে নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির নেতা, মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রমুখ কিছু লোক আহত হন। পিডিপি'র প্রেসিডেন্ট মিঃ নুরুল আমীন এক বিবৃতিতে বলেন: "আওয়ামী লীগের এসব কার্যকলাপের নিন্দা করার মতো ভাষাও আমার নেই। পরিষ্কার মনে হচ্ছে—আওয়ামী লীগ ফ্যাসীবাদী-পদ্ধতি অনুসারে তাদের নিজেদের পরিকল্পনা অন্যের উপর চাপানোর সঙ্কল্প করেছে। আওয়ামী লীগ এই প্রথমবার এই নীতি অনুসরণ করেনি।"

১৯৭০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, চট্টগ্রামে, দৈনিক "বুনিয়াদ" এবং দৈনিক "সংগ্রাম" পত্রিকার দফতর দু'টির উপর হামলা করা হয়। এই দু'টি পত্রিকায় আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে পরিচিত ছিলো। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ মাহমুদ আলী এই হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন: "সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হীন একটা হামলা।" তিনি আরও বলেন, "যদি 'বুনিয়াদ' ও 'সংগ্রামে'র সঙ্গে আওয়ামী লীগের আদর্শের মিল না হয়, তাহলেই কি তাকে ধ্বংস করতে হবে? এই কি পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রদত্ত গণতন্ত্রের নমুনা?"

১৯৭০ সালের ৩১শে জুলাই ঢাকার পাকিস্তান অবজারভার সহ কয়েকটি পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, "আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক সশস্ত্র কর্মীরা হালি শহর হাউসিং এষ্টেটের অধিবাসীদের আক্রমণ করে। এর ফলে, ২২ জন আহত হয়। তার মধ্যে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর। খবরে জানা যায় যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা চেয়েছিলেন যে উল্লেখিত লোকেরা ধর্মঘট পালন করুক। কিন্তু সে এলাকার অধিবাসীরা তা করতে অস্বীকার করে।"

১৯৭০ সালের ৭ই আগষ্ট দৈনিক "পূর্বদেশ" এর খবরে প্রকাশ—"২রা আগষ্ট ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ টাউন ময়দানে পিডিপির এক জনসভা হয়। সে সভায় আওয়ামী লীগের একটি দল এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করে। খবরে প্রকাশ, সভাস্থানের সন্নিকট শেখ মুজিবুর রহমানের গোপালগঞ্জস্থ বাসভবন থেকে,

সভায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের বের হয়ে আসতে
দেখা যায়।
১৯৭০ সালের ২৩শে আগষ্ট দৈনিক "সংগ্রাম" পত্রিকার খবরে জানা যায় যে
"চট্টগ্রামের দৈনিক 'আজান' পত্রিকার দফতর। এর পূর্বদিন ছাত্র বলে পরিচিত
একদল যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দুষ্কৃতিকারীরা ৬ দফার সমর্থনে এবং "জয়বাংলা"র
শ্লোগান দিচ্ছিলো। 'আজান' কর্তৃপক্ষকে তারা ৬ দফা সমর্থন করে তাদের পত্রিকায়
লেখার হুকুম করে। পত্রিকার একজন কর্মচারী হামলার সময় আহত হন।"
ঈশ্বরদীর ইসলামী ছাত্রসংঘের জেনারেল সেক্রেটারীকে ১৯৭০ সালের ১৯শে
সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা আক্রমণ করে। চাঁদপুর শহরের কাছে বাবুরহাটে
১৯৭০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা নিজাম-ই-ইসলামের অফিসে
হামলা করে এবং অফিসের আসবাবাদি বিনষ্ট করে বলে খবর পাওয়া যায়।
ঢাকার দৈনিক পত্রিকা "সংবাদ" এর ১৯৭০ সালের ২০শে অক্টোবরের খবরে
প্রকাশ যে—"১৯৭০ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার হাজারীবাগ এলাকার ১৩নং রাস্তার
বাচ্চু মিয়ার বাসভবন আওয়ামী লীগের একদল দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করে। দুষ্কৃতি-
কারীরা বাড়ীর উপর পাথর নিক্ষেপ করে, বাড়ীর মেয়েদের গালিগালাজ করে এবং
দু'টি নাবালক ছেলের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়।"
১৯৭০ সালের ৫ই নভেম্বর, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট
এবং আওয়ামী লীগের এক প্রাক্তন অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট মিসেস আমেনা বেগম, এক
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে "আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা তাঁর মাতুয়াইলস্থ নির্বাচন দফতর"
আক্রমণের নিন্দা করেন। এক সপ্তাহ পরে (১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর) "পূর্বদেশে"র
এক খবরে প্রকাশ যে—"ঢাকার অন্তর্গত জিঞ্জিরার কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রার্থী
খাজা খয়েরউদ্দীনের সমর্থকগণ বিরাট এক মিছিল বের করেন। গতরাতে আমীরবাগ
গ্রামে আওয়ামী লীগ কর্মীরা মিছিলের উপর হামলা চালায়। ফলে ৫ ব্যক্তি
আহত হয়।"
জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল।
সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বন্যায় পূর্ব পাকিস্তান ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক
গৃহহীন হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়। বন্যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারদের
যাতে ভোটদানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য জনসাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে
দেবার দাবী জানায়। সে দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের
তারিখ ঠিক করলেন ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বা-
চনের তারিখ নির্দিষ্ট হলো ১৭ই ডিসেম্বর। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকি-
স্তানে ঘূর্ণিঝড়-দুর্যোগের কবলে পড়ে। বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাকৃতিক
বিপর্যয় বলে অভিহিত এই ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় বাঁধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতাগণ সাহায্য এবং পুনর্বাসনের কাজে মনোযোগ দেওয়ার
জন্য নির্বাচন আরো পিছিয়ে দেবার জন্য আবেদন জানান। নির্বাচন অভিযান স্থগিত
করার নানা অসুবিধা থাকলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ নির্বাচন

স্থগিত করায় তাদের সম্মতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কিছু-কাল একেবারে নীরব থাকার পর, প্রস্তাবিত স্থগিতের বিরুদ্ধে শুধু যে প্রতিবাদ জানালেন তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বললেন—পূর্ব পাকিস্তান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপায়ণের জন্য আরোও 'লক্ষ লক্ষ জীবন' উৎসর্গ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন স্থগিত করলেন না। ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর এক ভাষণে তিনি বলেন—"এই সরকারের উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য আর সে লক্ষ্যে আমরা অটল থাকবো।"

সেই একই ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তিনি বরাবরই বলে এসেছেন যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং "একসঙ্গে বসবাস করার একটা চুক্তি"। আর সেইজন্যই শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মতৈক্য বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেন: "নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমি এ-কথায় বলতে চাই যে তারা তাদের নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে বেশ কাজে লাগাতে পারেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্রের প্রধান বিধানগুলোর ব্যাপারে একমত হতে পারেন। এজন্য কিছুটা আদান-প্রদান দরকার, দরকার পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করাও দরকার।"

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে।* জাতীয় পরিষদের ভোটে দু'টি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাদের একটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ, যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যটি হচ্ছে পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি, যে ৮৫টি আসন লাভ করে। দু'টি দলই সংগঠনের দিক থেকে আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সবাই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী।

নির্বাচনের শেষে আশা করা হয়েছিলো যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই আইনগত কাঠামো আদেশে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতায় এসে পৌঁছুবেন। আওয়ামী লীগ জোর দিয়ে একথাটাই বোঝাতে চাইছিলো যে এক পাকিস্তান কাঠামোর বাইরে ৬ দফায় কোন কিছুর পরিকল্পনা করা হয়নি। প্রেসিডেন্টকেও তারা এই ধারণা দিয়েছিলো। ১৯৭১ সালের ২৮শে জুনের বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন: "আমাদের আলাপ-আলোচনা চলাকালে আমি যখন মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে-ছিলাম, তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে সেগুলোর রদবদল সম্ভব। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান বিধানগুলো পরিষদের বাইরে ছোট

* জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি ঘূর্ণি উপদ্রুত নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন এক মাস পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

ছোট বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মীমাংসা করবেন।" পশ্চিম পাকিস্তানের
সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতা মিঃ ভুট্টো সমেত, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান
রাজনৈতিকদলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছুনোর
জন্য ঢাকায় যান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ফলপ্রসু শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত
আলাপ-আলোচনার জন্যই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টও বেশ কয়েকবার পূর্ব পাকিস্তান
সফরে যান। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধান মন্ত্রী বলে
প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করার
জন্য কয়েকবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি।
তিনি ৬ দফা সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে
৬ দফা এখন জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তার রদবদল করা সম্ভব নয়।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের ভোল সম্পূর্ণরূপে পালটে গেলো।
১৯৭১ সালের ৭ই জানুয়ারীর প্রকাশিত "অটোয়া, গ্লোব ও মেল" পত্রিকার খবরে
প্রকাশ: "মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছেন যে প্রয়োজন হোলে আমি বিপ্লবের আহ্বান
জানাবো।" ১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, "ব্যাঙ্কক পোষ্ট" এর এক খবরে জানা যায়:
"আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে ৩১৩টি আসন-বিশিষ্ট জাতীয়
পরিষদের মধ্যে তাঁর দলটির স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার
দলের ৬ দফা কার্যসূচী পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন
করবেন।"

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়।
এতে বলা হয় যে আগামী ৩রা মার্চ ঢাকায় অধিবেশন শুরু হবে। ১৯৭১ সালের
১৫ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন যে "সংখ্যাগরিষ্ঠ
দলের কাছ থেকে কিছুটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের" আশ্বাস না পেলে, তাঁর দল
অধিবেশনে যোগদান করবে না।

তিনি আরো বলেন: "আমার মনে হয় আমরা এমন কিছু করতে পারি যা আমাদের
উভয়কেই খুশী করবে। কিন্তু যে শাসনতন্ত্র ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে
ফেলেছে এবং যে শাসনতন্ত্রের কোথায়ও এক চুল পরিমাণ কোন অদল-বদল করা চলবে
না, সেই শাসনতন্ত্রকে শুধু মেনে নেওয়ার জন্যই যদি আমাদের ঢাকায় যেতে বলা হয়,
তাহলে আপনারা আমাদের ঢাকায় দেখবেন না।" ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী
শেখ মুজিবুর রহমান বলেন—"আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার। ৬ দফা ভিত্তি করেই
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে।"

পাঁচটি ফেডারেটিং ইউনিট সমন্বিত পাকিস্তান ফেডারেশনের জন্য জাতীয় পরিষদ
একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কোন ইউনিট এককভাবে তার ইচ্ছে অন্য চারটি
ইউনিটের উপর চাপাতে পারবে না। ফেডারেশনের অন্য সব ইউনিটের পক্ষে শাসন-
তন্ত্রটি গ্রহণযোগ্য করতে হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল নীতিগুলোর ব্যাপারে সব ইউ-
নিটের মধ্যে মতৈক্যের একটা ব্যাপক ভিত্তি থাকা দরকার।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়ার ফলে, এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো যদি কোন সমঝোতায় না আসেন, তাহলে জাতীয় পরিষদের পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না এবং জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। আর তাহলে ভোটদাতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের সুপরিকল্পিত কার্যসূচী উভয়ই নিষ্ফল হয়ে যাবে।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট একটি বিবৃতি দেন। সে বিবৃতিতে তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মোকাবিলা সারা দেশের উপর একটা বিষাদের ছায়া ফেলেছে। তিনি আরো বলেন যে—"সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এরমধ্যে আবার হিন্দুস্তান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সেজন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"আমি বার বার বলেছি যে শাসনতন্ত্র একটা সাধারণ আইন নয় বরং একসঙ্গে বসবাস করার একটা চুক্তি। সুতরাং সুষ্ঠু ও প্রয়োগযোগ্য একটি শাসনতন্ত্রের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে—শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যথাযথ পরিমাণে অংশ গ্রহণের উপলব্ধি।"

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সাথে সাথে পরিষ্কারভাবে আশ্বাসও দেওয়া হলো যে 'শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য পূর্ব উল্লেখিত পরিস্থিতি অনুকূল' হলেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরই আমাদের চরম লক্ষ্য—আর তা সবকিছুর উর্ধ্বে।

শেখ মুজিবুর রহমান এর জবাব দিলেন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চের বিবৃতিতে তিনি বলেন—"এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারী কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বাংগালীর পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে—গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া।"

আওয়ামী লীগের ধর্মঘটের আহ্বান ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযান সারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু করে দিলো। আইন ও শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। (এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।)

শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের সমাধান করার উদ্দেশ্যে, ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ—প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী গ্রুপের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আমন্ত্রণ জানালেন। যে সম্মেলনে যে সব নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো তাঁরা হচ্ছেন: